ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে, ব্যাপারও বিরাট হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিস্ফুট হয় না। কাজেই সর্বপ্রথমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্বও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilization) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড-খণ্ড মানব-সমাজ এক-একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানবসমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে ; তাহা মানবমনের সর্ব-সাধারণত্ব। আর ইহাই বিশ্বমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে এক-একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক-একটি বিশেষ অংশের অনুষ্ঠান ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক-একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে ; এক জাতির সমস্যা হয়তো অন্য জাতির সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব নাই ; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে অথচ তজ্জন্য পরিচ্ছদ, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্রে এই সমস্যার রূপের বিশেষ হেরফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রশ্ন হইয়াছে বিভিন্ন—সমাধানও বিভিন্ন। বাহ্য জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বৈষম্য এক অধিক তীব্র যে কল্পনাই করা যায় না, তাই অন্তর্জীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিঁকিয়া থাকিতে

পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নূতন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনের ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীক-রোমও যেন প্রত্নাগারে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বক্ষের কঙ্কাল-পঞ্জর দেখি, দেখিয়া বিস্মিত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে প্রশংসা এমন কি কাব্যের আকারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অনুপ্রেরণাও যোগাইতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায়?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। (চৈনিক সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি, অন্য দেশে, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।)

অন্য দেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনা-বাহিনীর সভ্যতা। বাহ্য জীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সভ্যতার জীবন-সমস্যার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এরকম বস্তু-সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই সে বাঁচিয়াছে। ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এ-টুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতারই আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষরপরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ-দেশে বিদ্যা কখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা

তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোন দিন বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm সর্ববিদ্যাই ধর্মের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা-গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এদেশে কোন বিদ্যা watertight compartment- এর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণী ধর্ম ; তাহাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ঘটে নাই। প্রাচীন যুগে ধর্ম ভিন্ন তাই এদেশে কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্পসৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুতন্ত্রের অভাববোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক দিয়া দেখিলে কোন গোলযোগ থাকে না। ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর ; রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজার মধ্যে আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই ; মূর্তিপূজার অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। এখানে abstract-কে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা concrete-এর হুবহু নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিব্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চিরপথিক তাঁহারা, দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম কৃষকের কুটিরেও তাঁহাদের গতি—রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিব্রাজকদের জন্য কুটাইলশালার[1] অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহলশালার গর্বে গৌরববোধ করিয়াছে। যেখানে ইঁহাদের বিচার-সভা বসিত সেখানে ইঁহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি ভারতবাসীর মর্মে ইহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণকথা ভারতের মর্মকথা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এগুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাহা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের মুখে কত অজানা সাধক কবির যে গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্যাচর্য, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গালগান প্রভৃতি সঙ্গীত এ যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারব্রতও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখাপড়া এক বস্তু নয়—এ কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল যে প্রশ্নের সম্পূর্ণ

সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্য দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সুদূর বোঘাস কুই[2]—শিলালিপিতে, তেল-এল-অমরনার[3] পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের[4] দলিলপত্রে। কাসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উল্লেখ করিয়াছে। মিত্তানীদের সহিতও আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্যাগমনের পূর্বে হইয়াছিল, এ কথা এখন আর বলা চলে না। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোঘাস কুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে, বৈদিক শব্দের সহিত ইহার শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সহিত এসিয়া মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এই দূর দেশে হিন্দুদেবতারা শান্তিদেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী—শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সে পরিচয় তাহাদের লুণ্ঠনে। সে লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে। সেদিনও ইজিপ্ট তৃতীয় থুটমোসিসের[5] বিশ্বজয়ের জয়গীতি দুন্দুভিদ্বারা ঘোষণা করিতেছিল, এথেনিয়নরা ক্রীট দখল করিতেছিল এবং ফিনীসিয়রা এই প্রাচীন যুগে বাণিজ্যচ্ছলে পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়া প্রথম আসিরিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আসিরিয়ার অসুরেরা জাগিতেছিল।

মোহেঞ্জোদড়ে ও হরপ্পায়[7] যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল[8] (ASI, AR, 1923-24) বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকায় যে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অতিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঐ স্থানেই হইয়াছে। নীলনদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মত উহা ঐস্থানের একান্ত সম্পত্তি। আর মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি ; এবং বাবিলন, আসিরিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রবিড়ীয় অংশের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই ; কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতির সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রবিড়ীয় ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রবিড়ীয় বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রবিড়ী ব্রাহুই ভাষা[9] অনেক ব্যাপারেরই সূচনা করে। আবার দ্রবিড়ীরও পূর্বে নেগ্রিটো[10] সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরান-সম্পর্কের অকাট্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী বাণীপ্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহাপেক্ষা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌঁছাইয়া

দিবার জন্য। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'ধর্মবিজয়'। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

আর এই যুগেই রোম পৃথিবীর বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রোমক সভ্যতার পরিচয় দিতেছিল।

খ্রীস্টপূর্ব শতকে প্রবল-প্রতাপ মেনেন্দরকে[11] একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধ-রূপে দেখি, বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডেরিসের[12] পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ প্রচারক মেলে, আর তথাকথিত গান্ধারশিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে ; কত অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। ইজিপ্ট, এসিয়া মাইনর, পারস্য সকলের সহিতই ভারতের কোলাকুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্বর আসিয়া ভারতের দুয়ারে হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হুন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ব সবল সংস্কৃতিকে ইহারা নষ্ট করিতে পারে নাই, ভারতের আশ্চর্য প্রভাবে তাহারা গর্বিত হিন্দু হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীর্তি—রাজপুতরূপে। দ্রবিড়ী অন্ধসম্রাট গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি[13] নিজেকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেন, চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন ; শক উসভদাত[14], রুদ্রদামা[15] হিন্দুধর্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটিতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের সূচনা দেখা গেল। চীনে তো বহুপূর্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাইয়া গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষু পৌঁছিল, ব্রাহ্মণও পৌঁছিল। এসব ঘটিল খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। অফগানিস্তান পার হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এসিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা জাপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

[প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ. ৫১০-৫১৩]

প্রসঙ্গ-কথা

'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' মাসিক-পত্রিকায় (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) ১৩৪১ শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর ২৫ বছর পরে ১৩৭২ সালে তাঁর ৫৬টি প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা'য় (ড. সুশীলকুমার গুপ্ত সম্পাদিত) এটি প্রথম প্রবন্ধরূপে পুনর্মুদ্রিত হয়।

1 প্রবাসীতে মুদ্রিত মূল প্রবন্ধে মুদ্রাকর-প্রমাদে 'কুটাহলশালা'র স্থলে 'কুটাহনশালা' ছাপা আছে। সংকলিত গ্রন্থেও এই ভুল সংশোধিত হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে সংশোধিত শব্দ দেওয়া হয়েছে।

কুটাহলশালা (প্রাকৃত—কুতুহলশালা) ঃ প্রাচীন কালে দেশ-বিদেশ থেকে আগত পরিব্রাজকেরা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতেন এবং আলোচনায় বসতেন। সেই পরিব্রাজকদের আশ্রয় এবং আলোচনার স্থল ছিল কুটাহলশালা। —*MDPPN*, i.p. 629

2 বোঘাস কুই (Boghaz Keui) ঃ এসিয়া মাইনরের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গোরা প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এখানের ধ্বংসাবশেষে অনেক ভাস্কর্য ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। —*En. Brit.* iii. p. 778, *MEML*, p. 227, *MMBA*, pp. 5, 262, 280

3 তেল-এল-অমরনা (Tel-el-Amarna) ঃ প্রাচীন মিশরের রাজধানী অখেত-অতোন, চতুর্থ আমেনোফিল (ইখনতোন) কর্তৃক স্থাপিত ১৩৬০ খ্রী-পূ.। বর্তমান নাম তেল-এল অমরনা। ইখনতোনের মৃত্যুর পর এই রাজধানী পরিত্যক্ত হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৮৯১-৯২ খ্রী. অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি কর্তৃক ধ্বংসস্তূপ খননকার্য আরম্ভ হলে রাজপ্রাসাদ, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। —*En. Brit.*, xxi. p. 893, *MEML*, pp. 323, 328

4 কাসাইট ঃ প্রাচীন মিডিয়ার অধিবাসী জাতিবিশেষ। এঁরা সমগ্র বাবিলন অধিকার করেছিলেন। অসুর-জাতি দ্র.। —*MMBA*, p. 218

5 মিতানী, মিত্তান্নী, মিটানি ঃ উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন জাতি ও রাজ্য। —*MEML*, p. 323

6 তয় থুটমোসিস (Thutmosis III) ঃ মিশরের ফ্যারাও ১৮শ বংশীয় রাজা। এঁর সময় সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মেডিকোর যুদ্ধে জয়লাভ করে মিশর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া ও এসিয়া মাইনরের তৎকালীন রাজ্যসমূহ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। —*En. Brit.*, viii. p. 47

7 মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা ঃ ১৯২১-২২ খ্রী. একটি প্রাচীন নগরকেন্দ্রিক সিন্ধুসভ্যতার সন্ধান পান ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মোহোঞ্জোদড়ো ও পঞ্জাবের মন্ট গোমারী জেলার হরপ্পা নামে স্থান দুটির ধ্বংসস্তূপসমূহ হতে ভারতীয় এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আনুমানিক ৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রী-পূ. এই সভ্যতা স্থায়ী ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। —কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী ঃ **প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্‌জো-দড়ো**, ভূমিকা পৃ. ১১

8 মার্শাল (Marshall, Sir John Hubert) (১৮৭৬—১৯৫৮) ঃ সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অধিকর্তা (১৯০২—১৯২৮)। জন্ম—ইংলণ্ডের চেস্টারে। শিক্ষা—ডালউইচে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর

শিক্ষাগুরু আর্থার জন ইভান্স। ভারতে তাঁর আমলে ভীটা, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, নালন্দা, বৈশালী, শ্রাবস্তী, সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে উৎখননের কাজের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি প্রাক্-ইতিহাস যুগের সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলিতে উৎখনন ও এই সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন। অবশ্য মোহেঞ্জোদড়োতে উক্ত সভ্যতার নিদর্শন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবিষ্কার করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি যৌথভাবে Mohenjodaro and The Indus Civilisation, 3 vols. (1931), The Monuments of Sanchi, 3 vols. (1940), Taxila, 3 vols. (1951) সম্পাদনা করেন। তাঁর গ্রন্থ—Excavations at Taxila ঃ The Stupas and Monasteries at Jaulian (১৯২১), ই.।—ভা-কো.

9 ব্রাহুই ভাষা ঃ ব্রাহুইয়া প্রাচীন বালুচি-গোত্রীয়, দ্রবিড় থেকে কিছু ভিন্ন। —*D.R. Bhandarkar Volume* (1940), p. 115

10 নেগ্রিটোঃ ভারতীয় উপমহাদেশের আর্যপূর্ব প্রাচীন প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যজাতি। এরা কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায়। বর্তমানকালে আসল নেগ্রিটো জাতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিনকোপি জাতিতে, মলয় উপদ্বীপ ও পূর্বসুমাত্রায় সেমাং জাতিতে। ভারতে নেগ্রিটো জাতীয় কালো মানুষ এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে। —রোমিলা থাপার, পৃ. ১১

11 মেনেন্দর ঃ মিনান্দার, বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে মিলিন্দ। বিদেশীয় গ্রীকেরা কপিশা, গান্ধার, শাকল ও পঞ্জাবের বহুস্থানে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। গ্রীসের দিমিত্রিয় বংশীয় মেনেন্দর অন্ধ্রদেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি ইন্দো গ্রীক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল শাকল (শিয়ালকোট) বা শাগল। মেনেন্দার ইন্দো-গ্রীক শক্তিকে আরও দুর্ধর্ষ করে তুললেন। তাঁর অধিকারে ছিল সোয়াট উপত্যকা, হাজারা জেলা ও ইরাবতী (রাভি) নদী পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব। তাঁর মৃত্যুকাল ১১৫ খ্রী-পূ.। পতঞ্জলির সমসাময়িক। শোনা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে তাঁর দেহাবশিষ্ট ভস্ম সংগ্রহের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছিল। 'মিলিন্দ পঞহো' (মিলিন্দ প্রশ্ন) নামে পালিভাষায় এক গ্রন্থে শাকল বা শাগল দেশের রাজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের কথোপথন লিপিবদ্ধ আছে ও কাশ্মীরদেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র মিলিন্দের নাম উল্লেখ আছে। মিলিন্দ নিঃসন্দেহে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। —Goldstuker : *Panini, his place in Sanskrit Literature,* p. 234, *DCI.,* pp. 16-17 ; রোমিলা থাপার, পৃ. ৬৭, *VSEHI*, pp. 213, 225

12 হেলিওডোরস (Heliodoros) ঃ একজন গ্রীক দূত। ইনি তক্ষশিলাবাসী দিওনের (Dion) পুত্র। মহারাজ আন্তি অলিকিতের কাছ থেকে হেলিওডোরস শুঙ্গবংশের

অন্যতম রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের কাছে (তাঁর রাজত্বের ১৪ বছরে) আসেন। ১৯০৯ খ্রী. ভিলসা নগরে আবিষ্কৃত এক শিলাস্তম্ভের খোদিত লিপিতে জানা যায় হেলিওডোরস বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই গ্রীক দূত হেলিওডোরস বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও ইনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। —রোমিলা থাপার, পৃ. ৬৮, *VSEHI,* p. 240

13 শাতকর্ণি (শাতকর্ণী, সাতকর্ণী) ঃ সাতবাহন রাজাদের মধ্যে যিনি প্রথম বিখ্যাত হন, তিনি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী। চতুর্দিকে সামরিক শক্তি বিস্তার করে তিনি 'পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাঁচির একটি শিলালিপিতে তাঁকে 'রাজন্ শ্রীশাতকর্ণী' বলা হয়েছে। 'দক্ষিণাপথপতি' উপাধিও তিনি গ্রহণ করেন। শাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং শকদের উচ্ছেদ করেছিলেন।

শাতকর্ণীর পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র লিখি গেছেন, 'গৌতমীপুত্র শকদের উচ্ছেদ করে ক্ষত্রিয় গর্ব খর্ব করেছিলেন। তিনি চার বর্ণের মধ্যে মিশ্রণও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে ব্রাহ্মণদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। শাতকর্ণীর মা একটি শিলালিপিতে লিখেছেন—গৌতমীপুত্র শক, যবন ও পল্লবদের বিতাড়িত করেছিলেন। খ্রী. দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ তাঁর রাজত্বকাল। শাতকর্ণীর বিধবা মহিষী নয়নিকা নানাঘাট লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। সেই নানাঘাট-লিপিতে শাতকর্ণীকে 'এক-ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে। *JRAS, (n.s.),* (1890), p. 639 ; *DCI,* pp. 14, 16

14 উসভদাত (উসভদত্ত, ঋষভদত্ত, প্রা. উসভদাত) ঃ উসভদাত নামটির অপেক্ষা উসভদত্তের প্রচলন বেশী। ডাফের Chronology of India-য় উসভদত্ত বন্ধনী মধ্যে (উসভদাত) এবং প্রাকৃত অভিধানে ঋষভদত্ত বন্ধনী (উসভদাত) আছে। উসভদাত ছিলেন শক রাজা দিনিকের পুত্র ও ক্ষত্রপ রাজা নহপানের জামাতা। এঁর রাজত্বকাল খ্রী. প্রথম শতক। নাসিকের একটি গুহায় তাঁর আদেশে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি আছে। তা থেকে জানা যায়—রাজা উসভদাত একটি তন্তুবায় সংঘকে ঐ গুহা ও তিন হাজার কাহাপন দান করেন। ঐ অর্থ বিনিয়োগের সুদ হতে, যে কোন সম্প্রদায় বা অঞ্চলের সংঘসদস্যের গুহায় থাকার সময় পোষাক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহিত হবে। —*BASSI,* i. p. 4. ; *DCI.* p. 23, রোমিলা থাপার, পৃ. ৭১, ৭৩

15 রুদ্রদামা (রুদ্রদামন) ঃ সুবিখ্যাত শক রাজা। তিনি কচ্ছ অঞ্চলের অধিবাসী। জুনাগড়ে প্রাপ্ত ১৫০ খ্রীস্টাব্দের একটি দীর্ঘ শিলালিপিতে তাঁর কীর্তিকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তিনি দৃঢ় হস্তে ধর্মকে পালন করেছেন। তিনি নানা বিদ্যা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যুদ্ধে কৌশলী ও দ্রুতগতি ও অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত ; 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত।

সাতবাহন রাজাদের সঙ্গে শকদের বহুদিনের বৈরিতা দূর করার উদ্দেশ্যে নিজ কন্যার সঙ্গে সাতবাহন রাজার বিবাহ দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পর্কের তেমন উন্নতি

হয় নি। পরবর্তী কালে সাতবাহন রাজাকে তিনি দুবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু নিকট সম্পর্কের জন্য উচ্ছেদ করেন নি। —রোমিলা থাপার, পৃ. ৭০-৭৩, *VSEHI* pp. 210, 217